/ /

'ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।'— এটি কোন পর্যায়ের পদ? পদকর্তা কে? পদটির কাব্যসৌন্দর্য বিচার করো।

আলোচ্য 'ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।' পদটি শাক্ত পদাবলীর অন্যতম পর্যায় 'বিজয়া'র অন্তর্গত।

পদটির রচয়িতা হলেন পদকর্তা রামপ্রসাদ সেন।

মেনকা যে কন্যাকে কাছে পাওয়ার জন্য বার বার গিরিরাজের কাছে নিবেদন করেছিল, যে কন্যাকে পেয়ে মেনকা হৃদয়ে প্রশান্তি এনেছিল, সেই কন্যা তথা উমাকে নিয়ে যেতে উপস্থিত মহাকাল শিব। এ কেবল কন্যার স্বামী গৃহে যাওয়া নয়। মা-এর সুখ-দু:খ, আশা-আকাঙ্খা যে কন্যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়, সেই কন্যাকে কেড়ে নেওয়া আসলে মায়ের হৃদয়-বাগানের সমস্ত পাপড়িগুলোকে বারুদের আগুনে নিক্ষেপ করা। আলোচ্য পদটিতে সেই হৃদয়ের উত্তাপ কয়েকটি মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। যথা—

ক. বিজয়ার বিদায় জনিত সংকট

খ. শিবের স্বরূপ উপস্থাপন

গ. সমাজে কন্যার অবস্থান

ও ঘ. সমাজ বাস্তবতা বনাম মাতৃহৃদয়

দশমী মাত্রই কন্যাকে বাপের বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এ কারণে মাতৃহৃয়ের ব্যাকুলতা, কন্যাকেন্দ্রিক ভালবাসা বিসর্জনেরই নামান্তর হয়ে ওঠে। তাই গিরিরাজের কাছে আবেদন —

'ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার।'

— মেনকা দিনের বেলাতে অন্ধকার দেখছেন। শরীর ভয়ে কাঁপছে। এ যেন এক অশনি সংকেত। তাই গিরিরাজকে 'প্রাণনাথ' সম্বোধনে প্রাণ রক্ষা করার আকুল আবেদন ধ্বনিত হয়েছে। মেনকার এ আবেদন ফলপ্রসু হল না। কারণ,—

'বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গনেশ-মাতা, ডাকে বার বার।'

— বাঙালি সমাজে জামাই-আদর অতি পরিচিত একটি চিত্র। এর মাঝে শিবের এই অবস্থান যে দুর্লভ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে—তা এ কথাই প্রমাণ করে যে শিব ও উমার বাপের বাড়ির সম্পর্ক সুখকর নয়। তাই বাড়ির বাইরে থেকেই শিব ডাক দিয়েছে— উমা নয়, গৌরী নয় ; 'গনেশ-মাতা'-কে। যে সমাজ নারীকে কর্তব্য আর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অসচেতন থাকতে দেয়নি, সেই সমাজের স্বরূপ তুলে ধরতে পদকর্তা উমাকে

জানাতে চেয়েছেন—মেনকার বাৎসল্য রসে জারিত থাকার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন সময় সন্তানের জন্য বাৎসল্য রসে বিজারিত হওয়ার। এ চিত্র কোনো কন্যা পক্ষের মায়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই যে মেনকা আগমনির পদে গিরিরাজকে পাষাণ বলেছে, সেই মেনকাই পাষান দেহ, পাষান প্রাণ শিবের কাছ থেকে রক্ষার জন্য 'প্রাণনাথে'র কাছে আশ্রয় চেয়েছে। মেনকা ভুলে যায়নি বাঙালির শেষ আশ্রয় ভগবান। বিড়ম্বনা করার নি:শর্ত অধিকারও শুধু তারই রয়েছে। তাই সমাজে কন্যার অবস্থানটি উঠে এসেছে এভাবে—

'তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,

হায় হায় , একি বিড়ম্বনা বিধাতার।'

বলাবাহুল্য যে সমাজে মা কন্যার সুখ-দুখ, আনন্দ-বেদনার সঙ্গী থেকে তিল তিল করে বড়ো করে তুলেছে। বিয়ে হওয়া মাত্র সে সন্তানও তার নয়। নাড়ির টান কুণ্ডলীপাকিয়ে বুকে জড়ো হয়, তাকে শান্ত করার অধিকার এখন মায়ের হাতে নেই। তাই 'পরের ধন' বলে মেনকার আক্ষেপ।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের কথা মানুষকে মেনে চলতে হয়। এ কথা মেনকা জানে না—তা নয়, মানতে চায়না কেবল মাতৃ-হৃদয়। তাই 'হায়, হায়' ধ্বনির মধ্যে সেই অস্বীকার ধ্বনিত হয়। পদকর্তাও জানেন এ সত্যকে। তাই সমাজ বাস্তবতার কাছে পরাজিত মাতৃহৃদয়কে সান্তনা দিতে চেয়েছেন এভাবে—

'প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার।।'

— চকোর-চকোরী জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রের সুধা পান করে। দিনের বেলা ইচ্ছে করলেও সে আশা মেটার নয়। ঠিক তেমনি ভাবে নির্দেশিত সময়ে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি যেতে দিতে হবে। যতই মনে বেদনা থাক, তা নিবারণের জন্য মেয়েকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখা সম্ভব নয়। এ উদাহরণ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল জীব-বৈচিত্র্যের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের সীমাবদ্ধতাকে স্মরণ করায়। সেই সঙ্গে রামপ্রসাদের উপস্থাপনা প্রথমত পৌরানিকতার আড়ালে মেনকা, উমা, শিব প্রমুখ চরিত্রকে রক্ত-মাংসের জীবন্ত চরিত্র হিসেবে নির্মাণের দাবী রাখে। দ্বিতীয়ত পুরাণের ঘটনাকে সমকালীন ও একালের কাছে প্রাসঙ্গিক করে তোলার পেছনে তাঁর কৃতিকেই স্মরণ করায় ।

— চন্দন কুমার মান্না
বিভাগীয় শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, খেজুরী কলেজ ॥